# ‘চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই’

জীবন সায়াহ্নে এসে যতই কবরের দিকে ধেয়ে চলেছি, শুধু অতীতের গান বারবার মনে ভেসে ওঠে। অন্যায় কিছু দেখলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠি লেখার ভাষাও কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। বিষয়টা সাইকোলজিক্যাল। এতে আমার কিছুই করার থাকে না। শিল্পীর গাওয়া গান আমি জীবনের গান হিসেবে নিয়েছি। গানের তাল-লয় থাকে। তেপ্পান্ন বছর ধরে এদেশ চলতে দেখছি, কোনো তাল-লয় তো কোনোদিনই খুঁজে পেলাম না। এমন অনপেক্ষ-অনভিপ্রেত কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত। যে গানের কথা মনে ভাসছে তা হচ্ছে: ‘আমি ছন্দহারা এক নদীর মতো ভেসে যাই, আমার চলার শেষ কোন সাগরে তার ঠিকানা তো জানা নাই..’।

গানের কথায় আছে আমাদের অবস্থার প্রতিফলন। অনেক লেখায় আমি প্রায়শই একটা কথা লিখি যে, শিক্ষা নিয়ে বাজেটের কোনো সমস্যা নেই, এ অবস্থায় বাজেট যতই বাড়ানো হোক না কেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে কোনো লাভ হবে না। আধুনিক কারিকুলামেরও কোনো সমস্যা নেই; টেক্সট-এর বেশ কিছু সমস্যা আছে, তা অল্প দিনেই পরিবর্তন করা সম্ভব। সমস্যা অন্য জায়গায়– বাস্তবায়ন সমস্যা। বাস্তবায়ন সমস্যার মধ্যে পরিবেশগত সমস্যাই প্রকট। সেটাই বারবার বাস্তবে দেখছি। অর্থাৎ পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সুন্দর, পরিবেশ উপযোগী ও সঠিক না হলে সবকিছুই অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। হচ্ছেও আসলে তাই। শিক্ষা খাতে দুহাত দিয়ে টাকা ঢেলে দিলেই যে শিক্ষার উন্নতি হবে, অনেকেই এমন কথা বলবে; কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়, বিবেচনাযোগ্যও নয়। অন্তত আমি এ মতের ঘোর বিরোধী। শিক্ষাঙ্গনে ভালো বেতন দিয়ে ভালো শিক্ষক আনতে হবে, এটা সত্য। পরিবেশ ভালো না হলে ভালো শিক্ষক নিয়োগেও সমস্যা হবে। বর্তমানে তো শুধু শিক্ষক নিয়োগ নিয়েই নয়, শিক্ষার্থী নিয়ে, শিক্ষক নিয়ে, শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, শিক্ষাঙ্গন নিয়ে দেশব্যাপী জাতিবিধ্বংসী অপরাজনীতি চলছে। চলছে বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে টাকা লুটপাট। সবকিছু তো পত্রিকাতেই দৈনিক পড়তে পড়তে গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ ঠেলা কে সামলাবে? এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব শিক্ষামানের উপর আছে। গায়ের জোরে ও মুখের জোরে কোনো কিছুকে অস্বীকার করা, আর নিরেট বাস্তবতা এক কথা নয়। ভাবার অবকাশ নেই যে, আমি কোনো একক রাজনৈতিক দলকে দোষারোপ করছি। আমি আজ তেঁতাল্লিশ বছর ধরে শিক্ষকতা জীবনে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করছি। প্রতিনিয়ত প্রাথমিক শ্রেণি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছি। বিভিন্ন দেশের সামাজিক অবস্থার সাথে এদেশের মানুষ ও সমাজকে প্রতিনিয়ত মেলাচ্ছি। এটাই আমার পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা।

পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব বিভাগের লেখাপড়া যে সমান, তা বলা যাবে না, এখানেও মান উন্নয়নের যথেষ্ঠ সুযোগ আছে। আবার যেসব ছাত্রছাত্রী সেখানে ভর্তি হচ্ছে তাদের সবার ভিত্তিমান যে ভালো এটা বলা যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ক’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলও তো আমরা দেখলাম। ১২/১৩ শতাংশ পাশ, বাকিরা সবাই ফেল। ভর্তির সুযোগ পাওয়া আর ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করা কিন্তু এক কথা নয়। আমি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকতা করি, বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামানের কথা নাইবা বললাম। কোনো ক্লাসে দশ শতাংশ ছেলেমেয়ের ভিত ভালো, এটা আমি বিবেচনায় আনতে প্রস্তুত নই। মাশাআল্লাহ, একশত আটটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারও বসে নেই, প্রতি জেলায় কমপক্ষে একটা করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে অঙ্গিকারাবদ্ধ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় যত্রতত্র সরকারি-বেসরকারি কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ার সুব্যবস্থার তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। সবাই মিলে জ্ঞানের আলো বিতরণ করছে, দেশ শিক্ষাশূন্য জ্ঞানের রাজ্যে ভাসছে। শুনতেই ভালো লাগে। ওপরে বলা গানের আরেকাংশ এ-রকম: ‘সীমাহারা দূর-দিগন্ত পারে, জানিনা কোথা ভেসে যায়, কোন সে অভিসারে, যারে খুঁজে ফিরি আমি, তারে কি পাব না আর ...’। আমি তো শিক্ষা ও শিক্ষিত লোক খুঁজে ফিরছি, যাদের ওপর নির্ভর করে দেশ টিকে থাকবে। অনেকের মধ্যে লেখা ও পড়া কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সন্ধান সুদূর পরাহত। এরাই তো লেখাপড়া শেষে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে এরা খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এরাই এদেশের সম্পদ (?)। কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসায় নামছে, কেউ ছদ্মবেকার, কেউবা পুরো বেকার। সার্টিফিকেটের অভাব নেই, অভাব সুশিক্ষার, যে ভিতের ওপর দেশ দাঁড়িয়ে থাকবে। জনগোষ্ঠী বিশাল, জনসম্পদ অত্যল্প। লেখা ও পড়া জানা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের কাছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিরাপদ নয়। সার্থক আমাদের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা। দেশচালকরা তো রথসারথি। এ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। ‘জন্ম আমার ধন্য হলো মা

গো, অমন করে আকূল হয়ে আমায় তুমি ডাকো-ও-ও'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না আছে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষা, না আছে মানবতাবোধ-জাগরুক শিক্ষা, না আছে কর্মমুখী শিক্ষা। ভরা সাগরে নৌকা বেয়ে চলেছি, যেদিকে তাকায় পানি আর পানি; এক ঢোক পানিও খাবার উপযুক্ত নয়। সমাজের মানুষ গেছে দূষিত হয়ে। আমার আরো আপত্তি অন্য কোথাও। বাঙালি ছেলেমেয়েদের মেধা তো অন্য কোনো জাতি-গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমি তা দেখেছি। কিন্তু এমন হলো কেন? গলদটা কোথায়? রাতে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবি, সমীকরণ মিলাতে পারি না। কখনো সমীকরণ মেলাতে পারলেও করার কিছু থাকে না। 'পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে'। 'উপায় নেই গোলাম হোসেন!' দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিলে করার তেমন কিছু থাকে না। দূষিত মানুষ যদি নিজের বিপদ নিজেই তৈরি করে, জনগোষ্ঠী যদি জন-আপদে রূপ নেয়, সে বিপদের জন্য কান্নাকাটি করে কী লাভ!

এক বিপদ তৈরি করেছি স্থানীয় সরকারে রাজনীতির প্রার্থী মনোনয়নে। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ দেশ শোষণ ও মানুষ শোষণের আঁখড়া হয়ে উঠেছে। 'তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমার পরাণ যাহা চাই'। কলুষিত রাজনীতি এখন গ্রামে-গঞ্জে, রান্নাঘরের দরজায়, বিয়ের আসরে, বাসর ঘরে, গরুর হাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আরেক বিপদ তৈরি করছি বা করেছি প্রতি জেলাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনায়। প্রতিষ্ঠাতাদের মনে কোনো পবিত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে। আমি নির্বোধ মাস্টারসাহেব। আমার চোখে ধরা পড়ে শুধু জঘন্য রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে দলীয় লোকজন পোস্টিং দেওয়ার হিড়িক। যত বিশ্ববিদ্যালয় বৃদ্ধি, তত চাটুকার পোষার ব্যবস্থা, চাটুকার পোস্টিং। শিক্ষার মানোন্নয়নে তারা নেই, তারা চাটাচাটিতে মহাব্যস্ত। তাদের দিয়ে দলবাজি ও চেতনার ব্যবসা করার উদগ্র বাসনা। দলীয় কন্টাক্টরদের কিছু কামাই-রোজগারের পথ সৃষ্টি, আবার ছাত্র রাজনীতির দোহায় দিয়ে নিজস্ব চামচাদের 'গামছা' কেনার অর্থ-সংস্থান। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে ভবিষ্যত মানবতাহারা নেতা-নেত্রী আবাদের উৎকৃষ্ট খামার। কেননা 'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়'। পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অভাব সব অঘটনের মূলে থাকে। সরকারের নতুন তৈরি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। কৈশোর পেরিয়ে গেছে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও বারবার যেতে হয়। সত্য বলতে কি, সেখানকার পড়ার মান ও রাজনৈতিক বন্দনা আমাকে আশাহত করেছে। কয়েকটা নিরেট ইটের বিল্ডিং দেখেছি, শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ দেখিনি। তা ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জন করবে কোত্থেকে! এর ওপর আবার প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ভিত খুবই দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পড়া ও তা নিয়ে গবেষণা করতে দিলে সেটা তাদের মাথার ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়। এ নিয়ে নিত্য বসবাস। আমার এ চাঁচাছোলা কথায় অনেকে আমার প্রতি রুষ্ঠ হবেন জানি, কিন্তু এছাড়া ভালো ভাষা এক্ষেত্রে আমার নেই। দেখবো কানা ছেলে, তাকে 'পদ্মলোচন' বলা তো শিক্ষকতা পেশায় চলে না। এ শিক্ষার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর এবং এ ব্যাধি নিতান্তই দুরপনেয়।

এত কথা মনে আসছে বেশ কয়েকটা দিন ধরে বুয়েটে আবার ছাত্র রাজনীতি ঢোকানোর খায়েশ দেখে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা চান না সেখানে আবার 'যমদূত ঘরে ঢুকুক'। কেউ কেউ বলছে, রাজনীতি করা না-কি তাদের সাংবিধানিক অধিকার। যে-সব ছাত্রছাত্রী জীবনে মানুষ হওয়ার জন্য বুয়েটে ভর্তি হয়েছে, সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ লেখাপড়ার পরিবেশে থাকে, রাজনীতি না করাও তো তাদের নাগরিক অধিকার। রাজনীতি যে কেউ করুক তাতে কারো বাধা নেই। কিন্তু হিংসুটে গুরুভক্তি করতে গিয়ে সহপাঠির মাথায় আঘাত, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, অন্যের ক্ষতির কারণ হওয়া, হলে হলে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' তৈরি করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালানো, পার্শ্ববর্তী এলাকায় চাঁদাবাজীর ব্যবসা করা, 'ধর্মের ষাঁড়' হয়ে যা-খুশি-তাই করা সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকবৃন্দ মানবে কেন? প্রত্যেক ছেলেমেয়ে অভিভাবকদের এক টুকরো আশার আলো। তারা তো বুয়েটে তাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতি শিখতে পাঠাইনি। এ ছাড়াও দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্ম পরিবেশ নষ্ট হয় এমন চাটাচাটির রাজনীতি করার জন্য 'যমদূত' পুষতে তাদের গুরুরা ছাড়া সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন কেউ সম্মত কী-না আমার বিশ্বাস হয় না। কারো এতই যদি রাজনীতি করার ইচ্ছে হয়, বৃহত্তর সমাজে গিয়ে রাজনীতি করলে কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ সকল প্রতিষ্ঠানে কেন? আমাদের দেশ চালকদের একজনকে সেদিন বলতে শুনলাম, শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হোক তা তিনি চান না। আমার বলতে ইচ্ছে করে, দেশচালকরা জঙ্গিবাদ নিমূলের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব 'ধর্মের ষাড়' পুষছেন, তারাই বা জঙ্গিবাদের তুলনায় কম কীসে? শুধু নামেই পার্থক্য। পেশাব দিয়ে তো আর টয়লেট পরিষ্কার করে পূত-পবিত্র করা যায় না। জঙ্গিবাদ না থাক, এটা আমিও চাই। কিন্তু তা দমন করার জন্য তো আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ রয়েছে। দেশে আইনের শাসন

প্রতিষ্ঠা করলেই তো যথেষ্ট। গুরুদের আশির্বাদপুষ্ট 'ধর্মের ষাড়' পোষা ও প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে কী? আমাদের দেশের সব অনিয়ম, অব্যবস্থা, অশান্তি, দুঃশাসনের মূলে তো আমাদের এই গুরুদের বিকৃত চিন্তাই দায়ী।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির কথা উঠলেই অনেকে '৫২ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জল সময়ের কথা তুলে ধরে বর্তমান 'যমদূত মার্কা ধর্মের ষাড়'-এর মতো রাজনীতির ক্ষমতায় ক্ষমতাধর হয়ে বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার লালসায় পুষ্ট ছাত্র-রাজনীতির বৈধতা দিতে চান। এরাও মতলববাজ। 'দাদার আমলে খেয়েছি দই, সেকথা আজো কই'। এসবই রাজনৈতিক ব্যবসা ও লুটপাট টিকিয়ে রাখার নির্লজ্জ ফন্দি। যে কোনো দেশপ্রেমী সুশিক্ষিত লোক এসব ভালই বোঝেন। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা আমিও সমর্থন করি, কিন্তু এইডস দম্পতি এইডসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সন্তান উৎপাদন বন্ধ রাখাই সমীচীন। দেশের রাজনীতি সুস্থ ধারায় এলে তখন ভেবে দেখা যাবে। নইলে এইডস দম্পতির সন্তানও এইডস রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য। এভাবে তো দেশ এইডস রোগে ভরে যাবে।

এদেশ 'চাটার দল'মুক্ত করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। হয়তো কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মৌন সাপোর্টার, কিন্তু নীতি-নৈতিকতা ও সুশিক্ষা আছে, যাদের দেশের সম্পদ ও দেশ পরিচালনার দক্ষতা আছে– এমন অসংখ্য লোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমার অজানাও অনেকে আছেন। এদেশেই তাদের বসবাস। পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় তারা দেয়ালের কোনো কোণায় কোটরের পেঁচার মতো মুখ লুকিয়ে জীবনযাপন করে চলেছে। এরাও দেশপ্রেমী এবং এদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। এদের বাইরে বের করে এনে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই কেবল এদেশের মুক্তি নিশ্চিত হবে।

(২০ এপ্রিল ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

**ড. হাসনান আহমেদঃ** অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ